এক অন্ধ নদীর উপাখ্যানকে নিয়ে কয়েকটি কথা:

অরুণকুমার বসু

১

আমার কলকাতায় জন্ম, বেড়ে-ওঠা পুব-কলকাতার সীমান্তে। উল্টোডাঙা-বাগবাজারে স্লুইস গেটে ধাক্কা-মারা যে খালটা দেড়শো-দুশো বছর ধরে মার্কহাট্টা ডিচ নামে পুরনো কলকাতার মানচিত্রে চিহ্নিত, সেটি উল্টোডাঙা মানিকতলা নারকেলডাঙা বেলেঘাটাকে ছুঁয়ে পূবে জোড়ামন্দিরের কাছে এসে মিশেছিল অন্য একখানে। সেখানে ভেড়ি-জলাজমি পেরিয়ে আরও নদীনালা— মাতলা পেরিয়ে বিদ্যাধরীর সঙ্গে তা মিশে গেছে। আমার পৈতৃক ভিটে যশোর জেলায় ছিল। সেটা ছিল মধুমতীর কূলে লোহাগাড়া থানায়, নড়াল পরগনায়। ১৯৪০ নাগাদ আমার বয়স যখন সাত-আট, তখনই আমার ঠাকুরদাদা কলকাতা শেয়ালদা কোর্টের চালু উকিল। যশোরের 'জমিজমা, খেত-বাগান তদারকিতে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শ্রীশ দাস নামের এক লোভী নায়েবের গ্রাসে চলে যাচ্ছে সম্পত্তি ও পাওনা গণ্ডা। দাদু নাকি তাঁর গাঁয়ে ইস্কুল বানিয়েছিল। আমার বছর দশ বয়সে সেই স্কুল তুলে দেওয়া হল শিক্ষকদের ঠিকমতো বেতন দিতে না-পারার কারণে, আর্থিক অনটনে। তাই এক সময় সেই স্কুলে সাইনবোর্ড থেকে শুরু করে টেবিল-চেয়ার ব্ল্যাক-বোর্ড, ফি বুক, লাইব্রেরির বই ইত্যাদি যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বড়ো নৌকোয় তুলে কলকাতায় পাঠানো হয়। সেই বিপুল কাঠের সম্পত্তির সঙ্গে খাঁচায়-পোরা একটি ময়নাও এসেছিল। সেই বোঝাই নৌকো মধুমতী থেকে ইছামতী ধরে, ফরিদপুর-খুলনা পেরিয়ে শেষে বিদ্যাধরী তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে বেলেঘাটার খাল ধরে আমাদের বেলেঘাটার বাড়ির অদূরে খাল-পাড়ে এসে মাল খালাশ করে আবার যাশোরে সেই নদীপথ দিয়েই ফিরে যায়।

সেই সুন্দরবনের চেনা কূল ছুঁয়ে, নোনা ঢেউয়ের ঝাপটা খেয়ে, গাঙচিলেদের সাম্রাজ্য পেরিয়ে সেই স্নিগ্ধ ইছামতী পেরিয়ে কলস্রোতা মধুমতীর চেনা মহলে। আমার বাল্যের গোষ্ঠীলীলা বেলেঘাটার এই খালের ধারেই। এখানেই বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা। শৈশব থেকেই দেখে আসছি। প্রতিদিন অজস্র ছোটোবড়ো নৌকো ভিড় করছে এই খালের ধারে। বস্তা বস্তা চাল নিয়ে, কাঠ নিয়ে। সেই চাল আসত ফরিদপুর-বরিশাল-যশোর থেকে। এই খালের পারের রাস্তার ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল একটার পর একটা চালের আড়ত। রাস্তাটার নাম আজও চালপট্টি রোড। এই চালপট্টি থেকে বস্তা বস্তা চাল, যার মধ্যে বেশির ভাগ ছিল বরিশালের বালাম চাল, সুন্দরবনের খাঁড়ি বেয়ে, বিদ্যাধরীর শীতল আর্দ্র বায়ু গায়ে মেখে, নামত আমাদের এলাকায়। যেখান থেকে ঠেলায়-লরিতে চালান যেত সারা কলকাতায় উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিমের বাজারগুলিতে। চাল ছাড়াও বিদ্যাধরীর

ভিতর দিয়ে অজস্র নৌকোয় আসতে দেখেছি শতশত কাটা গাছের গুঁড়ি, মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। যথেষ্ট অরণ্য নিধন করে ব্যবসায়ীরা সেই সুন্দরবনের আনাচ কানাচ থেকে চালান দিত কাঠ। খালপারে গড়ে উঠেছিল সারসার কাঠচেরাইয়ের কল। সকাল-সন্ধে বড়ো বড়ো ইলেকট্রিক করাতে পাটা হত সেই সুন্দরবনের অস্থিতুল্য সব কাঠ। চেরাই কাঠ থেকে তৈরি হত প্যাকিং বাক্স। সুন্দরবনের বুকের ধন বেলেঘাটার চেরাই-মেশিনে খান খান হয়ে ছোট ছোট তক্তা হয়ে পরিণত হত প্যাকিং বাক্সে। লরি বোঝাই সেই প্যাকিং বাক্স যেন আসাম ডুয়ার্সের চায়ের বাগানে চায়ের প্যাকেট বোঝাই করতে। কিংবা আরও হাজার পণ্যবাহনের দাসত্বে। এইখাল বেয়েই আমাদের পাড়ার কাকারা অন্ধকার থাকতে, রাত তিনটের কাছাকাছি সময়ে, জোড়ামন্দির পেরিয়ে, লবণহ্রদের ভেড়িতে মাছ চুরি করতে যেতেন। ফিরে আসতেন আলো ফোটার সময়। আরও মনে আছে, বাগুইহাটির কাছে তখন মার্টির রেলের স্টেশন ছিল। সেখানেও কাকাদের সঙ্গে দশ-বারো বছর বয়সে লবণভেড়িতে পাখি শিকারের সঙ্গী হয়েছি। বেলেঘাটা খালের সঙ্গে বিদ্যাধরীর যোগের কারণে তাই সুন্দরবনের চৌকাঠের এপারেই আমার বাল্যশৈশব কেটেছে।

শচীন দাশের এই উপন্যাস মাঝে মাঝে আমাকে আমার সেইদিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

যাত্রা যদিও বহু দূর থেকে। সুন্দরবনের নোনা বাতাস বেলেঘাটায় এসে হয়ত সবটা পৌঁছত না। কিন্তু সমুদ্রখাঁড়ি থেকে আনা বস্তা বস্তা শামুক জড়ো করা হত বেলেঘাটার পূবপ্রান্তে ভেড়ির ধারে। সেইসব শামুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি হত পাকা বাড়ির দেওয়াল চুনকাম করার জন্যে। কত সন্ধের বাতাস শামুক-পোড়ানো দুর্গন্ধে ভারি হয়ে থাকত, আজও স্মরণে আসে।

২

এবার আসি শচীন দাশের গল্প জগতের কাছাকাছি। শচীন দাশ নদীতান্ত্রিক লেখক। মাতলা থেকে শীতলক্ষা, নদীর টানে তাঁর কথা সাহিত্যের ডিঙি ভেসে যায়। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রবাহিনী নদী, নোনা জলের ঢেউ, নদীবেষ্টিত গ্রাম-পল্লি ও তার মানুষজনের ঘর-গেরস্থলি থেকে তিনি গল্প টেনে আনেন।

গত অর্ধশতকে বাংলা কথা সাহিত্যের কেতাবি আলোচনায় আঞ্চলিক উপন্যাস নামে একটি ধরতাই শব্দ চালু হয়েছে। সেই সঙ্গে নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে গড়ে-তোলা বেশ কয়েকটি নামী-অনামী উপন্যাস সম্পর্কেও বিশেষ ধরণের আলোচনার একটি কেতাবি ছাঁচ তৈরি হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'হলুদ নদী সবুজ বন', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' এবং সমজাতীয় বেশ গল্প-উপন্যাস নিয়ে গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণ নির্দিষ্ট উন্নাসিক কয়েকটি বৃত্ত তৈরি করে নিয়েছে। বৃত্ত বলেই তা সীমারেখায় আটকে

যায়। উপন্যাস-বিশেষের চরিত্রগুলির মৌখিক ভাষার লৌকিক প্রকরণ, তাদের ব্যবহৃত তৈজস, উচ্চারিত বাচন-প্রবচন, লোকগীতি, সংস্কার, পুজো-আর্চা, এইসব খুঁটিয়ে দেখার তালিকা সযত্নে প্রস্তুত করে, মোটামুটি-চরিত্র নিয়ে কিছু গতানুগতিক মন্তব্য প্রস্তুত করে, আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরা হয়।

শচীন দাশের উপন্যাসকে সেই দলে ফেলতে অসুবিধে আছে। 'নদীতরঙ্গের আয়না' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। এই উপন্যাসের চরিত্র ধনপতি, সুন্দরবনের সোমন্ত দুহিতা মাতলার বেপরোয়া বানভাসিতে সর্বস্ব হারিয়ে বাসা বেঁধেছিল গোবিন্দপুর রেল কলোনীর বস্তিতে। সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফের ঠাঁই পায় নোনাডাঙায়। সেখানে রঙের মিস্তিরি জীবিকায় দিন গুজরান তার। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ভর হয়— ভর পেয়ে সে এক নদীর 'টানে চলে যায় পাঁচশো বছর অতীতে, মঙ্গলকাব্যের সপ্তগ্রামে। সেখানকার সরস্বতী নদী তার সেই ঘোর-লাগা জীবনে ঘটায় এক মহা বিপর্যয়। সেই নদীর উৎসমুখের সন্ধানে তার অস্থির স্বপ্নপ্রয়াণ। তা না প্রত্নতাত্ত্বিক, না ঐতিহাসিক, না ভৌগোলিক। হারানো নদী, তার শুষ্ক খাত, তার স্থবির বন্দর, তার চলমান জীবনযাত্রার স্থির চিত্র। বর্তমান থেকে অতীতের যাত্রা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ হল টাইম ও স্পেস-কে নিয়ে কথাচরিত্রের এক অভিনব মনস্তত্ত্ব। আঞ্চলিক উপন্যাসের বাঁধা কাঠামো এক অভিনব মনস্তত্ত্ব। আঞ্চলিক উপন্যাসের বাঁধা কাঠামো দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। শচীন দাশ বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পাঠ নিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর গভীর সন্ধানের অভিজ্ঞতা আছে। আর এই সব অভিজ্ঞতার জমি থেকে যে ফসলটি তিনি বুনে তুলেছেন, তাঁর এক নাম 'নদীতরঙ্গের আয়না'। তার রহস্যলেখাটি তিনি স্বয়ং আমাকে জানিয়েছেন, এই উপন্যাসে কী ভাবে:

... ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসে উচ্ছেদ-হওয়া অসংখ্য মানুষেরই মিছিল। মঙ্গলকাব্যেরই উচ্ছেদ-হওয়া সেইসব মানুষ, নদী লুপ্ত হওয়ার কারণে যারা একদিন নিজেদের পেশা বদলে, নিজেদের অস্তিত্ব বদলেও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু উঠে এসে মিলিত হতে চেয়েছে বর্তমানের সঙ্গে। নতুন কোনো বসতি সন্ধানে।

বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে এক মিথ ভেঙে নতুন এক মিথের বিনির্মাণ করা হয়েছে এ উপন্যাসে। তাতে কখনও উঠে এসেছে সুন্দরবনের উচ্ছেদ-হওয়া মানুষ, কখনও আবার সপ্তগ্রামের পাশে, গাঙ্গুরের ধারে মঙ্গলকাব্যের সেইসব মানুষেরা। উঠতে চেয়েছে, উঠে আসতে চেয়েছে। বাধা কেবল হারিয়ে-যাওয়া এক নদী। যেন সেই নদীকে পুনরাবিষ্কার করলেই অতীত ও বর্তমান নতুন কোনো চেহারায় ধরা পড়বে। ধনপতি খোঁজে তাই সেই নদীকে। বালুকারাশি খুঁড়ে লুপ্ত সেই নদীকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করবে ধনপতি। আর সে আবিষ্কারে ধনপতির পাশে পাশে ঘোরে তার গতিবিধি লক্ষ করে, জানান দেয়

আপন বিহঙ্গভাষায়। রূপকথারই ওই পক্ষীযুগল (ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী)। সময় ও কাল সরে যায়। শুধু পড়ে থাকে অসংখ্য উচ্ছেদ হওয়া মানুষ। মানুষেরই মিছিল।

৩

শচীন দাশের 'নুন দরিয়া'-ও আঞ্চলিক উপন্যাসের তথাকথিত সংজ্ঞায় পড়ে না। সুন্দরবনের ঝাপসা হয়ে যাওয়া পুরনো এক মানচিত্রের কাগজের ওপর গাঢ় ঝকঝকে কালিতে লেখা এই উপন্যাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত এসে, স্যার এন্ড্রুজ ফ্রেজারের জঙ্গল-কাটা ও বসতিপত্তনের যুগকে ধরে ফেলা গেছে। তারপরই ঘটল সুন্দরবনের ইতিহাসের আধুনিক যুগের প্রথম ভূমি-বিদ্রোহ। মঙ্গলকাব্যের পালা ছেড়ে অনতি অতীতের ছাত্র হয়ে শচীন গড়ে তুললেন এক ইতিহাসের নাট্যরূপ, গল্পের দৃশ্যায়নে। এখানেও তাঁর আখ্যানটির কুলপরিচয় তিনি নিজে আমাকে এইভাবনায় পেশ করেছেন:

'সুন্দরবনে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে একটা বড়ো জায়গা পছন্দ হয়েছিল ফ্রেজারের। জায়গাটার নাম নারায়ণতলা। ফ্রেজার চেয়েছিলেন নারায়ণতলায় একদিকে থাকবে কৃষিক্ষেত্র ও অন্যদিকে সমুদ্রের ধারে উন্মুক্ত চমৎকার এক বেলাভূমি। তাছাড়া জঙ্গল কেটে চাষবাস শুরু করলে প্রাপ্ত জমিজমা থেকে আয়েরও একটা রাস্তা বেরোবে। তাই কাটা হল জঙ্গল। আর জঙ্গল কাটার জন্য সিংভূম ছোটনাগপুর ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুরের নানান অঞ্চল থেকে জমির লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা হল ভূমিহীন খেত মজুর ও আদিবাসীদের। এবং জঙ্গল কেটে আগাছা পুড়িয়ে ম্যাকা পরিষ্কার করে তৈরি হল জমি। কিন্তু জমির স্বপ্নে যে সমস্ত ভূমিহীন মানুষেরা এসেছিল, ঘন জঙ্গলে ও সমুদ্রে ঘেরা ভয়ংকর হিংস্র পশুকূল বিষাক্ত সরীসৃপ অধ্যুষিত সে বনভূমি থেকে তারা পালাতে তো পারলই না উপরন্তু জমি না পেয়ে তারাই করল এক সময় বিদ্রোহ। প্রথমে ক্ষোভ ও পরে ক্ষোভ থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। নুন সাগরের কোলে ফ্রেজারের কাছারি হল এক সময় আক্রান্ত। ফলে পালাতে বাধ্য হলেন ফ্রেজার ও তাঁর দলবল। প্রতিষ্ঠা পেল শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন মানুষেরই দাবি। সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জের ঘটে যাওয়া ওই বিদ্রোহই দক্ষিণবঙ্গে ভূমিহীন মানুষের প্রথম বিদ্রোহ।

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জনজীবন নিয়ে সেই শিবশঙ্কর মিত্র থেকে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় থেকে সমীর রক্ষিত কারও লেখাতেই এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত উল্লিখিত হয়নি। শচীন দাশই প্রথম তাঁর অরণ্য পর্ব উপন্যাসে কাকদ্বীপ চন্দনপিঁড়ি ডোঙাজোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের কথা লিখেছেন, শিশিরকুমার দাসের শৃঙ্খলিত মৃত্তিকায় এবং অভিজিৎ সেনগুপ্তর সুন্দরবনের ডায়েরিতে কিছু অতীত সন্ধিৎসার উপাদান আছে।

'অন্ধনদীর উপাখ্যান' শচীন দাশের এই উপন্যাসটি অন্য দুটিরও আগে লেখা, ২০০৪ সালে। 'নদী তরঙ্গের আয়না' ২০০৯ সালে এবং 'নুন দরিয়া' ২০১১-য়। 'নুন দরিয়া' সাম্প্রতিকতম হলেও আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি সুন্দরবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূমি-আন্দোলনের দায় শচীন দাশ আরও এক দশকেরও বেশি আগে বহন করেছেন। মোটের উপর, তাঁর এক এক উপন্যাসে গল্পের এক-এক রকম বিস্তার ঘটলেও যে ভূখণ্ড ও নদীনালা-ঢেউ-খাঁড়ি বেয়ে তিনি তাঁর কথার পানসি বেয়ে যেতে ভালোবাসেন, তাতে কিছু অন্তর্নিবিড় ঐক্য আছে। ধরা যাক 'নুন দরিয়া'-র কথা। তার প্রথম পৃষ্ঠায় সমুদ্রে মিশেছে নদী। সেই উত্তাল তরঙ্গবন্ধুর মোহানা থেকে উৎসপথে যাওয়ার ভাষাটি এই রকম :

''সেই কখন ভেসেছে ওরা। গতকাল ঠিক এ-সময়ে, বা তারও কিছু আগেই হবে বোধ হয়, বেতোড়ের ঘাট থেকে দাঁড় ফেলেছিল ওরা গভীর জলের বুকে। এরপরে বেতোড় অতিক্রম করে অনেকটা দক্ষিণে ঘুরে কলকাতার দিকে যাত্রা করেছিল। তারপর ভবানীপুর, কালীক্ষেত্র, বাঁশদ্রোণি পেরিয়ে গড়িয়া। গোড়ের ঘাটে পরপর নৌকাগুলি নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল সারারাত। পরে অদ্য প্রত্যুষে পুনরায় নোঙর তুলে হরিনাভী, আঁটিসারা, ময়দা, ছত্রভোগ ও খাঁড়ি হয়ে সোজা এই এখানে। নদীর পর নদী পার হতে হতে, জল কেটে কেটে বাঁদিকে এগিয়ে অতঃপর শীর্ণকায় একটি খালের ভিতর ঢুকে পড়েছে এখন। খালটি প্রথমে তেমন বড় না হলেও দৈর্ঘ্যে বিশাল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানান দ্বীপের কোল ঘেঁষে এঁকে বেঁকে ওদিকে ওই সপ্তমুখী নদীতে গিয়ে পড়েছে।''

'অন্ধনদীর উপাখ্যান'এও সেই নামগুলিকে আবার পাওয়া যাবে। এই উপন্যাসের ভূমিক্ষেত্র হল কলকাতার দক্ষিণ দিগন্ত পেরিয়ে টালি নালা, ক্যানিং মাতলা, গড়িয়া ছুঁয়ে মাতলা থেকে বিদ্যাধরী। 'নদী রঙ্গের আয়না', 'নুন দরিয়া' ও 'অন্ধনদীর উপাখ্যান' তিনের আখ্যান খাত ধরে একটি নদী-প্রবাহের জলধারা পায়ের পাতা ভিজিয়ে যায়। কলকাতার উপকণ্ঠ, কলকাতার সন্নিহিত মফস্বল। কলকাতার উত্তর নাটের রঙ্গশালার বাবুসমাজকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার যে রেওয়াজ প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র, থেকে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী গড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে শচীন দাশের কথা বিশ্বের ঈষৎই মিল, অমিলটাই বেশি। মিল মানুষের ভাঙ্গা গড়ায়। অমিল, তাঁরা পা রেখেছেন শক্ত ভুঁয়ে। শচীন দাশ জলে। আর তাঁর সব জলজ বৃত্তান্ত জুড়েই এক ভয়ার্ত হাহাকার। মজা নদীর গুমরে ওঠা, স্রোত-হারানো স্রোতস্বিনী যেন অকালে যৌবন হারিয়ে জরতীতে পরিণত হচ্ছে। এই ভয়ের শিহরণ। সত্যিই, নদী মজে যাচ্ছে! কী হবে? অন্ধ হওয়ার মুখে, নদীর সেই দৃষ্টি-হারানো মুখ-থুবড়ে পড়ার কথা গুছিয়ে বলার জন্যেই তাঁর গল্পে মানুষজন এসেছে, রাধারমণ দশরথ চিন্তামণি চম্পা, কঙ্ক টেমি-রা। এঁদিকে নদী মজছে,

চর জাগছে জলের বুকে, নৌকো যাচ্ছে আটকে। আবার তার ওপর আকাশে জলাভাব, খরা, বৃষ্টি নেই। গাজি মোবারক শা-র কাছে আর্তনাদ করে বলে এক মাঝি:

"যাচ্ছ তো হাটে... দেখবে গিয়ে কী অবস্থা খান হোইয়েচে গোড়ের হাটের। ক্রেতা আচে চাল নেই। ময়রা আচে মিঠাই নেই। হুঁকো আচে টিকে নেই। জেলে আচে মাচ নেই। মাঠ আচে ফসল নেই। লাঙল আচে চাষ নেই। কী যে বিচার আল্লার—"

শচীন দাশ সাহিত্যের জহুরি ছাত্র। তৎসহ ইতিহাস ঘেঁটে তাঁর কাহিনির উপকরণ-উপাদান, মালমশলা, তথ্য-ঘটনা-সংকেত এসব তিলতিল করে সংগ্রহ করেন। একালে কথাকাররা নিছক অভিজ্ঞতার নানা ঘাটের জল আর কল্পনার উদ্‌গার, এই দিয়েই উপাখ্যান গড়তে ভরসা পান না। গল্প কথাকে নিয়ে যেতে হয় সৃষ্টির বীক্ষণাগারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাপকাঠি প্রয়োগ করে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হয় আখ্যানের রূপরেখা। তবে প্রতিপাদ্যটি আগে থেকেই স্থির করা চাই। সেটি হল, নদীর রসহ্যময় গতি, নদীর-অন্তর্ধান, পরিবেশের ভারসাম্য বিকলন। বিজ্ঞানমনস্ক শচীন দাশ অন্যত্র এই সম্পর্কে অনেক গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। সেই গুলির সঙ্গে ঈষৎ জানাচেনা থাকলে তাঁর উপন্যাসগুলি আরও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। 'সমকালের জিয়নকাঠি'-র সুন্দবন বিশেষ সংখ্যা দ্বিতীয় খণ্ড (ডিসেম্বর ২০০৮) থেকে 'সুন্দরবনের নদী ও নদীসমস্যা' প্রবন্ধের কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি :

"...যে ১৯টি ব্লক নিয়ে ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সুন্দরবন অল্পবিস্তর তার প্রায় সবটাই ঘুরে সুন্দরবনকে বোঝার চেষ্টা করেছি। অনুভব করেছি আমি আমার মতো করে। এবং যতবারই গেছি বা ঘুরে ঘুরে বুঝতে চেয়েছি যতবারই, ততবারই একটা না একটা পরিবর্তন আমার চোখে ধরা পড়েছে। আর তা থেকেই বুঝেছি সুন্দরবন বড় দ্রুত বদলাচ্ছে। এবং এই বদল-বৃত্তান্তে আমাদের ভূমিকাও কম নয়। অর্থাৎ তাকে সংরক্ষণের পরিবর্তে বোধ হয় তার কাছ থেকে আমরা একটু বেশিই কেড়ে নিচ্ছি। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে ক্রমশ সুন্দরবন।... ষোড়শ শতাব্দী থেকে গঙ্গার মূল স্রোত পদ্মায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাগীরথী ও তার শাখা নদীগুলির জলের সরবরাহ কমে যায়। ধীরে ধীরে নদীগুলি মজে যেতে থাকে। এভাবে অনেক নদীরই প্রবাহ হারিয়ে গেছে। কেবল মাত্র শুষ্ক নদীখাত নিয়েই সে বেঁচে আছে। অথবা বিদ্যাধরী মাতলা ইছামতী কালিন্দীর কথাও বলা যায়।

মাতলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে মাতলাকে দেখে মুগ্ধ হলেও বুক কেঁপে উঠেছিল চল্লিশ বছর পরে, সেই মাতলার বুকে দেখি হাঁটু সমান জল। লোকে পায়ে হেঁটে পারাপার হয়। যদিও ভাঁটার সময়ই লোকে নেমে হেঁটে যাচ্ছে এখন তবুও বছর চল্লিশ আগে এ সাহসও হত না কারও, ভাঁটার সময়েও। শুধু তাই কেন, ক্রমাগত পলি ও বালি জমে জমে মাতলার তলদেশ এতটাই উঁচু হয়ে গেছে যে ক্যানিং

জেটিঘাট থেকে এখন সরাসরি লঞ্চে গোসাবা কিংবা সাতজেলিয়ার পথে পাড়ি দেওয়াই মুশকিল। এ অবস্থা রায়মঙ্গল, কলাগাছি, ডানা, গোমর, হোগল, বিদ্যা ইত্যাদি নদীর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে। পলি ও বালির দাপটে নদীগুলিতে বিশাল বিশাল চরা পড়ছে। ফলে নদীও তখন অন্যখাত ধরার চেষ্টা করে।...''

৫

সুন্দরবনের সন্নিহিত নদীগুলির এই অকাল-শুষ্কতার পট অবলম্বন করেই শচীন দাস তাঁর অন্ধনদীর উপাখ্যান নথিবদ্ধ করেছেন। সেইসব নদীর সংলগ্ন এলাকা ও জনপদগুলি সম্পর্কে দীর্ঘকাল তিনি তথ্যসংগ্রহ করেছেন। ভৌগোলিক দিক থেকে মানচিত্রের সততা ও জনজীবনের বৃত্তি-জীবিকা-ভাষা সম্পর্কে তাঁকে কল্পনার বা কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হতে হয়নি। শহর কলকাতা এখন তার অনেকটাই গ্রাস করে নিয়েছে। তাই তাঁর এই উপন্যাস থেকে বৃহত্তর শহরতলীর বেড়ে ওঠার ইতিহাসের উপকরণও সন্ধানী বা গবেষক বুঝে নিতে পারেন। অথচ তথ্য গল্পকে আহত করে না। মজা নদীর মৃত্যু ঘণ্টার আড়াল থেকে হৈমি-কঙ্কর নীরব ভালোলাগার রোমাঞ্চ, চম্পার বুকে কবি রাধারমণের সংযম-হারানো অভিযান, কোনো কৈবর্ত্যকন্যার রহস্যময় হাসির নেশায়, দশরথের উন্মাদ দশাও সর্পাঘাতে মৃত্যু, হাট-বাজার, পণ্যবাহী নৌকোর চলাচল, ঝড়বৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু নিবিড় আখ্যান রসের হাতছানিতে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। তবু পদে পদে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় নদীই এই কাহিনির মায়া। সেই নদী— সেই রহস্যময়ী অম্বার মতো ছলনাময়ী অথচ অম্বার মতোই অপস্রিয়মান। যে অঞ্চল, ভূসংস্থান, জনপদ নদী সন্নিহিত ঘাট বা বসতি, হাট বা পণ্য বিপণনকেন্দ্র এই আখ্যানে এসেছে তা কোনোটাই কল্পিত নয়। উপন্যাসের নানা ভাঁজ খুলে খুলে দেখা যাক কয়েকটি বিবরণ।

১. ''ওদিকে বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, বোড়াল, মহামায়াতলা, রাজপুর, জগদ্দল, হরিনাভির মতো গ্রামগুলো যেমন আছে তেমনি আছে এদিকে বাঁশদ্রোণী ও কুঁদঘাট। এমনকি টালিগঞ্জ থেকেও মানুষ আসতে দেখা যায়।'' (পৃ.৯)

২. 'তখন দক্ষিণ প্রবাহিনী গঙ্গায় কত যে নৌকা। জেলেরা যাচ্ছে মাছ মারতে। আবার কেউ কেউ বা ফিরেও আসছে। মাঝে মধ্যে তারই ভেতরে কোনো খড়বোঝাই গাদাবোট। লম্বা লম্বা শালতি। একসঙ্গে অসংখ্য বাঁকা বেঁধে ভেলার মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ঢালিরা। টালিগঞ্জের বাজারে।'' (পৃ.২২)

৩. ''এখন এই সময়ে কয়েকটি নৌকা, বাঁ দিকে ঘুরে সারি দিয়েই পরপর ঢুকে পড়েছে টালিগঞ্জের খালে। এ জলপথে খানিকটা এগোলেই সামনে শামুকপোতা। আর শামুকপোতার যেখানে শুরু তার মুখোমুখি পৌঁছেই খালটা যেন আচমকা হুড়মুড় করে বিদ্যাধরীকে স্পর্শ করেছে। এবং এত চকিতে ও দ্রুততার সঙ্গে যেন বিদ্যাধরীকে না ছুঁয়ে

তার উপায় নেই। অথবা না ছুলে যেন অচিরেই হারিয়ে যাবে বিদ্যাধরী তার সামনে থেকে, কিংবা এ-জীবনে বিদ্যাধরীর দর্শন বোধহয় অধরাই থেকে যাবে। টালির খাল ও বিদ্যাধরীর পরস্পর সংযোগের জায়গাটি তাই নদীই একরকম। আর হঠাৎ করে দেখলে নদী বলেই ভুল হয়। ভুল হওয়ার আরও একটি কারণ, চারিদিকে আদিগন্ত জলরাশি এমন যে এপার ওপার কিছুই দেখা যায় না। চোখে পড়ে কেবল বড় বড় ঢেউ ও ঢেউয়ের মাথায় কালো ফুটকির মতো বেশ কিছু নৌকা এবং দূর থেকে তাকিয়ে মনে হবে যেন নৌকাও নয়, ভাসমান কতগুলো জলপোকা, ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ে উঠছে, নামছেও আবার সঙ্গে সঙ্গে।" (পৃ ২৪)

৪. "আগে গঙ্গায় মাছের এত আকাল ছিল না। টালির সাহেবের খালটা কাটার আগে দক্ষিণপ্রবাহিনী গঙ্গা ছিল খরস্রোতা। দশরথের বাপ সহদেবরা বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত গোনে। গড়িয়া থেকে হরিনাভি হয়ে গাঙপথে ছত্রভোগকে বাঁ হাতে রেখে চলে যেত সমুদ্রে। কিন্তু খালটা কাটার পর গঙ্গা যেন অনেকটাই নিষ্প্রভ এখন। আগের মতো তেমন আর মাড় নেই গাঙে। পুতলি ঢেউও এখন চোখে পড়ে না তেমন।" (পৃ ২৮)

৫. বিদ্যাধরীর গা ধরে ধরে এই লবণ বিল।... আগে এদিকে একটা নদী ছিল। নদীর নাম সূতি। সে যে কী গতিশীল নদী... কালে কালে কী করে ওই নদী মরে গেল। আবার কী করে তার খাতে জল এসে জলসহ সেখানে জন্ম হল বিলের। একটি নয়, অনেক। অনেক অনেক বিল।..." (পৃ.৪০)

৬. "ছুটতে ছুটতে বেতোড়ের মুখে এসেই এক সময় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে বুঝি ব্যথাটা ভোলার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু করলেও। এই শরীরে ইদানীং আর তেমন জোর পায় না। ঘুরতে ফিরতে বড়োই কষ্ট। সারা উপাঙ্গে যেন বিষমৎ যন্ত্রণা। ধমনী যেন শুকিয়েও আসছে দ্রুত। তাই নড়ারও ক্ষমতা নেই। অথচ উত্তরে, বেতোড়ের কাছে এসে নিজেকে সামান্য একটু দক্ষিণে ঘুরিয়েই কলকাতা, ভবানীপুর ও কালীক্ষেত্র হয়ে সোজা গড়িয়া। গড়িয়ার পরে আবার দৌড়েছে বোড়াল, জগদ্দল, রাজপুর, হরিনাভি ও মাহিনগর হয়ে আঁটিসারা। এবং আঁটিসারার পর ময়দা, ছত্রভোগ ও খাঁড়ি হয়ে সোজা সাগরে। এতকাল তো এই করেই ছুটছিল। কিন্তু ওই সওদারগুলোর জ্বালায় নবাব আলীবর্দি আচমকাই একদিন তার কোমরের দিকে আঘাত হানল। তাকে কেটে, তারই ধমনীর প্রবাহকে নিয়ে পৌঁছে দিল সরস্বতীর বুকে। ফলে জন্ম নিল ঠিকই, তারই মতো আরও একটি প্রবাহ। আরও একটি গঙ্গা। কাটিগঙ্গা। কিন্তু হলে কী হয়, শৈশব থেকেই ওই গঙ্গা অচ্ছুৎ। কেউ ব্যবহার করে না ওর জল। না শুভ কর্মে, না মৃতদেহ সৎকারে। কাটিগঙ্গার বুঝি তাই এত ক্রোধ।" (পৃ.৫৮)

৭. "ফিরতি পথে মুলুটির বাঁকে এসেই খচ করে আটকে গেল নৌকাটা।

চাঁদ ছিল দাঁড়ে। টের পেয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, হাইদা — কী সর্বোনেশে কাণ্ড গো—

ততক্ষণে চমকে উঠেছে প্রায় সবাই..ই। গাঙের বুকে .চর জেগেছে। যাবার সময় জোয়ারে তা বোঝা না গেলেও এখন তা ভাটির টানে যেন অনেকটাই স্পষ্ট।...

কঙ্কর বুক থেকে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর গাঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় জানাল, গাঙ বোধায় মইরে আসতেছে কাকা—" (পৃ ১২১)

৮. 'বজরাটি যাবে ক্যানিং-এ। নতুন বন্দরে। যেভাবে হইচই করে অমন একটি বন্দর তৈরি করা হল ওখানে, এত জাহাজ এল, ডক তৈরি হল, জেটি তৈরি হল, কিন্তু এরই মধ্যে বন্দরটির ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার। কোম্পানির কোন্ এক সাহেব নাকি এসেছে এদেশে। নতুন বন্দর দেখে ও মাতলা নদীর উৎস স্থল— বিদ্যাধরী, করতোয়া ও আঠারো বাঁকি নদীত্রয়ের মিলনভূমি পরীক্ষা করে এসে নাকি তার মুখ গম্ভীর। বলেছেন তিনি, আগামী দু'তিন বছরের মধ্যেই এ-বন্দরের মৃত্যু আসন্ন। কেন না বিদ্যাধরীতে জলের প্রবাহ কমে আসছে। অতএব ক্যানিং-এর উপর থেকে নেমে এসে যেখানে এই নদীটি তার বিপুল প্রবাহ নিয়ে করতোয়া ও আঠারো বাঁকি নদীমুখের সঙ্গে মিলেছে সেখানে প্রবাহ না থাকলে আর মাতলা বাঁচে কী করে। মাতলার ভবিষ্যৎ তাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। (পৃ.১৬০)

উপন্যাস থেকে এতগুলি উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ একটাই। এ বইয়ের নাম অন্ধ নদীর উপাখ্যান। সেই অন্ধত্বের অভিশাপ স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তারই উপর মানুষগুলির বাঁচা-মরা। প্রেম-বিবাহ-কলহ-মৃত্যু। উৎসব-সর্বনাশের পালা গেঁথে তোলা হয়েছে। এ শুধুই গল্প-উপন্যাস নয়। এ হল একটি ইতিহাসের অঙ্গ। সাল-তারিখে, ঘটনার বিশ্বস্ততায় গড়ে-তোলা ইতিহাস নয়। এ হল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস, নদী সরে যাওয়ার, মজে যাওয়ার, মরে যাওয়ার সঙ্গে জনজীবন কেমন করে মজে যায়, বদলে যায় তারই ইতিহাস। লেখক এই কাহিনিতে ইতিহাসের কলক্রমেরও ইঙ্গিত রেখেছেন কোথাও কোথাও। আছে বঙ্কিমচন্দ্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন। শিবনাথ শাস্ত্রী। ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এঁদের নাম। তবু এই আখ্যানের মূল অভিমুখ নদীমাতৃক সুন্দরবন।

৬

শচীন দাশের এই উপন্যাস নিছক শারদসংখ্যায় শৌখিন আখ্যান-বিলাপ নয়। তাঁর অন্য উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে আগেই বলেছি, একটি অভিজ্ঞতার পুঁজি এবং নিরন্তর তথ্যসংগ্রহের সততার সঙ্গে আমাদের ভূসংস্থানের ইকোলজির পরিবর্তন ও সুন্দরবনের সর্বনাশের এই বেদনার বুনোটেই এর নির্মিতি। কত অনুপুঙ্খ জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করেছেন। যেমন স্থান নামে তেমনি মৌখিক উপভাষার ব্যবহারে। দক্ষিণবঙ্গের উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক

প্রকৃতি তিনি রপ্ত করেছেন। করেছেন সুন্দরবন-সংলগ্ন জনজীবনের কিছু লোক-সংস্কার প্রথা-বিশ্বাস ধাঁধাঁ প্রবচনের প্রয়োগ। তাছাড়া গর্জন ঘোড়া নিম বট পাকুড় তাল খেঁজুর থেকে বাসক ঘেঁটু আশশ্যাওড়া বনতুলসি বাসক বাগভেরেন্ডা এইসব গাছগাছড়া এসেছে সহজে। কৈবর্ত জীবনের বহু খুটিনাটির বিশ্বস্ত বিবরণ আছে এই বইয়ে। পাখির চেনা নামগুলিকেও কাহিনির ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে তিনি লিখেছেন বিল্লক, বায়স হরিতাল তিত্তিরি কুক্কুভ সাল্বিক ফিঙ্গক বগেড়ি বিগড়ি লালসার জলপিপি অঞ্জনি মানিকজোড় শামখোল। শুধু কি নাম? এই গল্পে দশরথ চরিত্রটি পাখি শিকারিদের পাখি-চেনাবার গাইড। সেই পাখি বিশেষজ্ঞ দশরথের চোখের সামেন হঠাৎ এক নৌকোভরা পাখির রূপকল্প ভেসে ওঠে। জেলেপাড়ার সেই ছলনাময়ী অম্বার ছায়া পড়ে তার ওপর! ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে মস্তিষ্কের সুস্থতা হারানো দশরথের বিহ্বল মায়াচ্ছন্ন চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় বাঘের পিঠে বসা সুন্দরবনের কল্প দেবতা। আবার পরক্ষণে এসে দাঁড়ান অম্বা—নাকের পাটায় সেই বর্তুলাকার নথ, মাথার খোঁপায় ভুঁইচাপার গুচ্ছ, জ্যোৎস্নালোকে চোখের কোলে যেন দাম শ্যাওলার ছায়া। দশরথের কালমৃগয়া:

এইভাবেই বাস্তবে অধিবাস্তবতায় অপরূপ হয়ে ওঠে অন্ধনদীর উপাখ্যান।

উপন্যাস-সূচনায় কথা মুখ অংশেই তিনি তাঁর গ্রন্থ প্রতিপাদ্য পেশ করেছিলেন একটি উদাসীন নদীর বিবরণে, যার নাম গঙ্গা, নৌকোর মালিকের জন্যে যার তাপ-উত্তাপ নেই। নিজস্ব ছন্দে নাচতে নাচতে সে আরও নিম্নভূমে সমুদ্রাভিমুখী, দক্ষিণ-প্রবাহিনী। লেখকের ভাষায়:

"দক্ষিণেই ছুটে চলেছে সে। ত্রিবেণী থেকে নীচে গড়িয়ে এসে বেতড়ের বিপরীতে শরীরটা ভেঙে কলিকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভবানীপুর, কালীক্ষেত্র, বাঁশদ্রোনী, গড়িয়া রাজপুর, হরিনাভি, আঁটিসারা, ছত্রভোগ ও খাড়ি ছুঁয়ে আরও নীচে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এ পথেই চৈতন্যদেব গিয়েছেন ছত্রভোগ। পরে সেখান থেকে নীলাচল। ইতিহাস বলছে, সওদাগর চাঁদ নাকি তাঁর বাণিজ্যতরী নিয়ে জাভা সুমাত্রায় যাত্রা করতেন এ-পথ দিয়ে। শুধু চাঁদ কেন এ রাস্তায় শ্রীমন্ত সওদাগরও গেছেন বার কয়েক। যাবার সময় কখনো-কখনো তিনি নৌকা ভেড়াতেন গড়িয়ার হাটে। গঙ্গা তখন খরস্রোতা। ভয়ঙ্কর ও বিপুলগতিতে বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। সেই সঙ্গে নিয়ে চলেছে ছোটোবড় নানা ধরনের জলযান। জাহাজও পাড়ি দিয়েছে এই পথে, সমুদ্র সন্ধানে। এরপর নেই নেই করেও প্রায় তিনশ বছরের অতিক্রান্ত একটি ইতিহাস। এ-সময়ে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হয়েছে তেমনি বিস্তীর্ণ দু'পাড়ের জনজীবনকেও করেছে প্রভাবিত। নতুন নতুন মানুষ এসেছে। নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। তারই পাশাপাশি নানা ভাষাভাষী বিদেশী পর্যটক ও বণিকের দল। দখল নিয়েছে তারা এ-জলপথের। চলেছে লুঠপাট। গাঙপথে

ডাকাতি ও মেয়েদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাওয়া। এভাবেই একদল গেছে, এসেছে অন্যদল। বাণিজ্যের পাশাপাশি এ জলপথকেও তারা করেছে নিয়ন্ত্রিত। ফলে গঙ্গা হয়েছে সঙ্কুচিত। ত্রিবেণী থেকে নেমে এসে বেতড়ের কাছেই প্রথম বাধাটা পায় সে। আর ক্রমাগত বাধায় গড়িয়ার কাছে এসেছে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে। সেটা ১৮৬৫ সাল।''

পরবর্তী সময়স্রোত গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটে গেছে মহাকালের সাগর-অভিমুখে। সেই নদীর খাত ধরে হেঁটেছেন শচীন দাশ। দশক পেরিয়ে শতক। কাল থেকে ভিন্ন কালে। তীরে তীরে মানুষের কত গল্প, কত কথা, কত ব্যথা কত চাপা বেদনা। তবু তাদের জীবন ঘিরে থাকে নদীই। নদীর ঘাট, নদীর ধারের হাট-বাজার, বনঝোপ, কর্দমাক্ত পাড়, জলের ওপর জলযান। পানসী ডিঙি সাম্পান। দলের ওপর ওড়ে গাঙচিল জলপিপি। জলের বুকে হঠাৎ জেগে ওঠে শক্ত চর। নৌকো যায় আটকে। নদীচর মানুষগুলোর জীবনে সর্বনাশের কালো ছায়া ঘনায়। জনপদ বাড়ে। বাড়ে ব্যবসায়ী, নানা বৃত্তির মানুষ, শোষক-শোসিতের সারি। চরে দখলিস্বত্ব কায়েম করে জমিলোভী মানুষ। অরণ্য কেটে কাঠ চালান দেয়ে ভিন্ন দেশে। নদী শুকোতেই থাকে।

এই ক্ষীণজীবী জলপ্রবাহ ও ভোগজীবী জনপ্রবাহের এই দুইয়ের টানা-পোড়েনেই শচীন দাসের আখ্যানবৃত্ত তৈরি হয়ে ওঠে। তারপর অন্তকথনে লেখক জানান তাঁর শেষ কথাগুলি :

''গঙ্গা এক ক্ষীণ স্রোতা। জল আছে বটে কিন্তু তাতে সরু একটি ধারা। সে ধারায় জোয়ার আসে না। ভাটাও খেলে না সেভাবে। তবে ছোটো ছোটো কিছু নৌকা এখনও চলাচল করে। সে নৌকায় থাকে হোগলা, টালি কিংবা খড়ের গোছা। তা বাদে দুদিকের চরায় নবীন তৃণগুচ্ছের মাঝে কোথায়ও ছাতারে ও ধবল বকের সারি। কোথাও বা আগাছার ঝোপ। বাগভেরেন্ডা, শেয়ারকুল ও ঘেঁটুর জঙ্গল। এবং তারই মাঝে মধ্যে চরায় নতুন আবাদ। লাঙল চলছে তাতে। নতুন পলিরই বুক চিরে। গঙ্গা তাই এখন রক্তাক্ত।

রক্তই ঝরছে। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দে চর ফেলে ফেলে যেন অজান্তেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে কোন অতলে— আগামীদিনের কোনও গবেষকের জন্য, ইতিহাসের নতুন কোনো উপাদান ছড়িয়ে রেখে। অন্ধ নদীর বুকে তাই বাতাসেরই এক অচেনা শব্দ। সে শব্দে কতই না কথা। কত ইতিকথা। উপকথা ও উপাখ্যান।''

এখনকার সময়ের শক্তিশালী লেখকের কলমে মানুষ ও প্রকৃতি একই সঙ্গে আখ্যানের কুশীলব হয়ে উঠেছে। অন্ধ নদীর উপাখ্যান তাই শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের রহস্যলীলায় একটি ক্ষুদ্র জলরেখা এঁকে যায়, সর্বাঙ্গে যার লবণের স্বাদ।

□ **লেখক বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক, ভাষা গবেষক এবং প্রাক্তণ বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক**